ইউনিট ৯

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন

পাঠ-১: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদ ও সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ কেবল আইন প্রণয়নের কেন্দ্রস্থল নয়; মন্ত্রীরা জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ায় তা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ (Unicameral) রয়েছে।। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এই আইন পরিষদই জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কল্যানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৬৫ (১) ধারা অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং সংবিধানের বিধানবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এ সংসদের উপর ন্যাস্ত। তবে জাতীয় সংসদের যে কোন আইন মানবাধিকার পরিপন্থী ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করতে পারে।

জাতীয় সংসদের গঠন

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। বাকি ১৫ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। পরে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ করা হয়। এ ৩০ জন মহিলা সদস্য সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। চতুর্দশ সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতে এ আসন বন্টিত হয়েছে। ফলে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বর্তমানে ৩৫০। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা বা নেত্রী হিসেবে গণ্য হন।। জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। অবশ্য এ কার্যকালের আগেই রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ (পরামর্শ) সাপেক্ষে। জাতীয় সংসদের গঠন প্রণালী সম্পর্কে সংবিধানের ৬৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একক নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় পরিষদ বা সংসদ গঠিত হবে। এর সদস্যগণ সংসদ সদস্য বলে অভিহিত হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কীভাবে গঠিত হয় তা আলোচনা করুন।

পাঠ-২: সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে বলতে পাবেন।
- সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হবার কারণ বলতে পারবেন।

সংবিধানের ৬২ (১), (২), (৩), (৪) সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।
যোগ্যতা ঃ কোন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচিত হবার যোগ্যবলে বিবেচিত হবেন যদি তিনি নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী হন-
প্রথমত ঃ তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে।

অযোগ্যতা

কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না যদি তিনি-

(১) যদি তিনি ঋণ খেলাপী হন।
(২) বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন।
(৩) দেউলিয়া বলে ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন।
(৪) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন।
(৫) কোন নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাবস্ত হয়ে অন্যূন ২ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তি লাভের পর ৫ বছর অতিবাহিত না করে থাকেন।
(৬) প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।
(৭) কোন আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। [অনুচ্ছেদ ৬৬ (২)]

কোন সংসদ সদস্যের সদস্য পদ সম্পর্কে কোন বিতর্ক বিশেষত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিষয়টির শুনানি ও নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। [অনুচ্ছেদ ৬৬ (৪)]।

সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হবার কারণ

দল পরিবর্তন না করলে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্যপদে একবার নির্বাচিত হলে সংসদের আয়ুস্কাল অনুযায়ী পাঁচ বছর সংসদ সদস্য থাকতে পারবেন। অর্থাৎ সংসদের কার্যকালের পূর্বে যদি সংসদ না ভেঙ্গে যায় তা হলে তিনি সংসদ সদস্যপদে বহাল থাকতে পারবেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সময় তাঁর সংসদ সদস্যপদ শূন্য বলে বিবেচিত হতে পারে-

(১) যদি সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করেন। তাহলে তাঁর সংসদ সদস্যপদ শূন্য হবে। তবে স্পীকার যথাযথ কারণে সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন।
(২) যদি তিনি সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।
(৩) সংসদ যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে সংসদের সকল আসন শূন্য হবে।
(৪) সংবিধানের কোন ধারা মতে তিনি যদি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন তাহলে তাঁর সংসদ সদস্যপদ শূন্য হবে।
(৫) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ মতে, কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হবার পর পরবর্তীকালে তিনি যদি উক্ত রাজনৈতিক দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে তার স্বীয় দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন তাহলে তাঁর সংসদ সদস্যপদ শূন্য হবে।
(৬) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকারের নিকট পেশ করলে।
(৭) তিনি যদি একাধিক আসনে নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে নির্বাচনের পর ৩০ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ এলাকার (একটি) প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে জানানোর পর তাঁর সুনির্দিষ্ট আসন ছাড়া তাঁর নির্বাচিত বাকি আসনগুলো শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.২

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সংবিধানের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ পূর্বক সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হবার কারণ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩: জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রক্ষমাতর অধিকারী। এটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মুখপাত্র। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত। আইনসভা সার্বভৌম। আইনসভার নিকট শাসন বিভাগ দায়ী না থাকলে তাকে সংসদীয় সরকার বলা যায় না। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমান সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় সংসদের কার্যাবলিকে প্রধানত ছয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: ১. আইন প্রণয়ন; ২. সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রণ; ৩. শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ; ৪. বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা; ৫. নির্বাচনী কার্য; এবং ৬. সংবিধান সংক্রান্ড় ক্ষমতা।

১। আইন প্রণয়ন: বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত [অনুচ্ছেদ: ৬৫ (১)]। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে এটি যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রবলিত আইনের রদবদল করতে পারে। সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেম প্রদান, বিধি-উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ্ষমাতা দান করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, প্রায় সকল বিল মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয় এবং তারা এটি সংসদে উত্থাপন করেন। সংসদের মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে এটি সহজেই গৃহীত হয়। বস্তুত মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের কর্তা। সংসদ এটি অনুমোদন করেন মাত্র।

২। সরকারি তহবিল নিয়ন্ত্রণঃ জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের অভিভাবক। সংসদের অনুমতি ও কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো প্রাকর কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ: ৮৩)। সরকার প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সংবলিত একটি বাজেট সংসদে উপস্থাপিত করবেন [অনুচ্ছেদ ৮৭ (১)]। বাজেট সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে, কিন্তু এর ওপর ভোট গ্রহণ করা যাবে না [অনুচ্ছেদ ৮৯ (১১)]।

এরূপ ব্যয়গুলো হলো রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক, কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, এটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশনার ও কর্মচারীবৃন্দ, সরকারের আর্থিক ঋণ, সুদ, আদালত কর্তৃক আরোপিত ব্যয় ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয় মঞ্জুরি দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ এরূপ মঞ্জুরি দাবি অনুমোদন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে বা এতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস করতে পারবে [অনুচ্ছেদ ৮৯ (২)]। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কোনো বিল বা মঞ্জুরি দাবি সংসদে উত্থাপন করা যায় না [অনুচ্ছেদ ৮৯ (৩)]।

৩। শাসনসংক্রান্ড় ক্ষমতা বা শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণঃ জাতীয় সংসদ সার্বভৌম পার্লামেন্ট। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। সুতরাং জাতীয় সংসদের অন্যতম কাজ হলো নির্বাহী বিভাগ তথা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এখানে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকে [অনুচ্ছেদ ৫৫(৩)]। মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদের আস্থা ভোগ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ড় ক্ষমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। সংসদে সদস্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদের প্রধান কাজ হলো সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা।

সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি শাসন সংক্রান্ত কাজে সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। তবে সংসদের সম্মতি ব্যতীত নির্বাহী বিভাগ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না কিংবা বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না [অনুচ্ছেদ ৬৩ (১)]।

সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অন্যান্য প্রস্ড়াবের দ্বারা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

৪। বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাঃ রাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের ওপর ন্যস্ত। সাধারণত বিচার কার্য বলতে যা বোঝায়, সংসদের সেরূপ কোনো কার্য নেই। তবে বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারে সংসদের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারককে অপসারণ করতে পারেন [অনুচ্চেদ ৯৬(২)]।

সাংবিধানিক ধারাবলে জাতীয় সংসদ এর সদস্যদের আচরণ বিচার করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো সদস্যের অসদাচরণের জন্য তাকে সংসদ কক্ষ থেকে বের করে দিতে কিংবা ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণ না করার জন্য সতর্ক করে দিতে পারেন।

জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণের বিচার করে অভিশংসন করতে পারেন। অর্থাৎ সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং অক্ষমতার কারণে সংসদ অভিশংসনের (Impeachment) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারবে। সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট কোনো অপরাধের কারণে স্পিকার, ডেটুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করতে পারে। এভাবে জাতীয় সংসদ ভিন্ন আঙ্গিকে বিচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কাজ পরিচালনা করে।

৫। নির্বাচনী কার্যঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের, সদস্যবৃন্দ, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, ন্যায়পাল, সংরক্ষিত ৫০টি আসনে মহিলা নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচনী ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। এছাড়া সংসদের বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন জাতীয় সংসদের অন্যতম নির্বাচনী কাজ।

৬। অধ্যাদেশ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Ordinance making powers and functions)ঃ সংসদ অধিবেশন না থাকলে রাষ্ট্রপতি যে সকল অধ্যাদেশ জারি করবেন সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে পেশ করতে হবে। সংসদে এ সকল অধ্যাদেশ অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হবে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে এ সকল অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাবে।

৭। সামরিক সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Militry Powers and Functions) ঃ জাতীয় সংসদ সামরিক ক্ষমতাও ভোগ করে। প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সংরক্ষণ এবং এগুলোতে লোক ভর্তি ও কমিশন মঞ্জুরী ইত্যাদি বিষয় সংসদের আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সংসদের সম্মতি ছাড়া কোন যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না বা দেশ কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলে বা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সংসদ অধিবেশনে বা থাকলে একে অনতিবিলম্বে আহ্বান করার বিধান রয়েছে। যুদ্ধ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংসদ যে কোন আইন তৈরি করতে পারে।

সার সংক্ষেপ

আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদ দেশে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কাজেই সরকারী তাহবিল নিয়ন্ত্রন আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা, মন্ত্রীসভা নিয়ন্ত্রনে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.৩

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

২. জাতীয় সংসদের আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা বর্ননা করুন।

পাঠ-৪: সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সরকারী ও বেসরকারী বিল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আইন প্রণয়ন ও সংস্কার জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ। তবে সেসব আইন অবশ্যই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি অনুযায়ী হতে হবে। বস্তুত জনবিচ্ছিন্ন কোন আইনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। চূড়ান্ত বিচারে জাতীয় সংসদ সম্মিলিতভাবে ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে সংসদের পরিকল্পনা সেল সত্যিকার অর্থে ছোট ছোট স্থায়ী-অস্থায়ী কমিটি গুলো। মূলত যে কোন ইস্যুতে এসব কমিটিই খসড়া আইন বা প্রতিবেদন তৈরী করে। পরবর্তীতে খুব অল্প সময়ের জন্য সংসদে আলোচনা হয়। যা হোক, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদকে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে (চূড়ান্ত নয়) বিল বলা হয়। বিল দু' প্রকার (ক) সরকারী বিল ও (খ) বেসরকারী বিল।

সরকারী বিল

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যখন কোন প্রস্তাব বা খসড়া জাতীয় সংসদে পেশ করেন, তখন তা সরকারী বিল বলে অভিহিত হয়। সরকারী বিল সংসদে উত্থাপিত হবার আগেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

বেসরকারী বিল

সংসদের যে কোন সদস্য (সরকারী, বিরোধীদলীয় বা স্বতন্ত্র) যখন কোন বিল উত্থাপন করেন তখন তাকে বেসরকারী বিল বলে। বেসরকারী বিল উত্থাপনের আগে অবশ্যই বিলের প্রতিলিপি সংসদের স্পীকারের নিকট নোটিশসহ প্রদান করতে হয়। অতপর বিলটি সংসদে উত্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়। এরপর প্রস্তাবটির পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিতে সংসদে (ভোটের জন্য) প্রদান করা হয়ে। প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি পেলে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

বস্তুত সংসদে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো- (১) বিল উত্থাপন (২) প্রথম পাঠ- (২) দ্বিতীয় পাঠ (৩) কমিটি পর্যায় (৫) তৃতীয় পাঠ (৬) রাষ্ট্রপতির সম্মতি।
নিম্নে এসব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিল উত্থাপন

মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য কর্তৃক বিল উত্থাপন করতে হয়ে। সরকারী বিল উত্থাপনের জন্য ৭দিন এবং বেসরকারী বিল উত্থাপনের জন্য ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান করা হয়।

প্রথম পাঠ

মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত সরকারী বিলের প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশিত হবার পর এবং বেসরকারী বিলের প্রস্তাব সংসদে পেশের অনুমতি পাবার পর প্রস্তাবক খসড়া বিলটি সংসদে পেশ করেন। এরপর তিনি খসড়া বিলটি সংসদে প্রথমবারের মতো পঠিত হোক বলে প্রস্তাব রাখেন। এভাবে বিলের প্রথম পাঠ শুরু হয়।

খসড়া বিলটি প্রথমবার পাঠ করার পর প্রস্তাবক বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হোক বা খসড়া বিলটি বিবেচনা করার জন্য স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক বা সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক বা জনমত যাচাই করার জন্য জনসমক্ষে প্রচার করা হোক বলে সংসদের নিকট প্রস্তাব রাখেন। সংসদ সদস্যরা এ সময় প্রস্তাবিত খসড়া বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর সংসদ কর্তৃক বিলটি নীতিগতভাবে গৃহীত হলে সিলেক্ট কমিটি বা স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি এ সময় বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক বিলটির মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন না করে প্রয়েজনীয় সংশোধনের সুপারিশ রেখে সংসদে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

খসড়া বিলটি সম্পর্কে কমিটি কর্তৃক বিচার-বিবেচনাপ্রসূত রিপোর্ট প্রবর্তিত ও তা সংসদে প্রেরণের পর প্রস্তাবক খসড়া বিলটি বিবেচনা করার জন্য সংসদের নিকট বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠের অনুরোধ জানাবেন। প্রস্তাবক কর্তৃক বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠের পর সংসদ বিলটির সকল ধারা-উপধারা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা করবে। দরকার হলে সংসদ সদস্যরা এসময় বিলটির প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব আনবেন। সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর স্পীকার ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

তৃতীয় পাঠ

সংসদ কর্তৃক বিলটির সকল ধারা-উপধারা বিবেচনা ও সংশোধনী গ্রহণ ও বর্জনের পর্যায় শেষে প্রস্তাবক সংসদের নিকট বিলটি তৃতীয়বার পাঠের অনুরোধ রাখবেন এবং বিলটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখবেন। তৃতীয় বার প্রস্তাবক কর্তৃক বিলটি পঠিত হবার পর সংসদ চূড়ান্তভাবে বিলটি গ্রহণ করবেন কি-না এ প্রশ্নের ওপর কার্যক্রম শুরু করবে। কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সমর্থনে বিলটি গৃহীত হলে স্পীকার বিলটিকে সত্যায়িত করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি

জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হলে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের ভেতর বিলটিতে সম্মতি দেবেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি না দিয়ে যদি সংসদে ফেরত পাঠান তাহলে সংসদ আবার বিলটি পর্যালোচনা করবে। বিলটি পর্যালোচনা পর সংসদ কর্তক পুনরায় গৃহীত হলে পুনরায় রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের ভেতর বিলটিতে সম্মতি দেবেন। রাষ্ট্রপতি এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিতে ব্যর্থ হলে ধরে নেয়া হবে যে, বিলটিতে তাঁর সম্মতি রয়েছে। বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই বিধিবদ্ধ আইনে রূপ নেবে। তবে বলা দরকার রাষ্টপতি দ্বিতীয়বার বিলটি বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারবেন না। সে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। রাষ্ট্রপতির অসম্মতি থাকলেও কার্যত তা আইনে পরিণত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৪

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সরকারী ও বেসরকারী বিল বলতে কী বুঝায়?

২. জাতীয় সংসদে কি ভাবে একটি বিল উত্থাপিত ও পাশ হয় তা আলোচনা করুন।

পাঠঃ ৫ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাহী বিভাগ ও সংসদের মধ্যমনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কেবল মন্ত্রীসভার প্রধান নন; তার উপরই নির্ভর করবে সংসদের মেয়াদ। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে কার্যত সংসদ ভেঙে যায়। প্রধানমন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচন করেন। মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতা বিচার করে তিনি মন্ত্রীদের কার্যত পদত্যাগে বাধ্য করেন। কখনোবা অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। সত্যিকার অর্থে, রাষ্ট্রপতি গঠিত সরকার ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট যেমন ক্ষমতা ভোগ করেন, ঠিক ততটাই ক্ষমতা ভোগ করেন সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী। এক সময় বলা হতো, বৃটেনে 'পার্লামেন্ট' সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পরবর্তীতে হ্যারল্ড লাস্কিসহ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, বৃটেনে কার্যত মন্ত্রীসভা (ক্যাবিটেন) সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। লৌহ মানবী বলে খ্যাত মার্গারেট থ্যাচারের শাসনকালের পর বলা হচ্ছে, বৃটেনে এখন মন্ত্রীসভা নয়, সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করেন আসলে প্রধানমন্ত্রী।

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠা আসলে এক অনিবার্য বিষয়। কেননা প্রয়োগিক ক্ষেত্রে জটিল রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা তেমনটাই দাবি করে ।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির তথা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন সংসদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একাধারে সরকার প্রধান, জাতীয় সংসদের নেতা এবং শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়। তিনি দেশ পরিচালনায় মন্ত্রীপরিষদকে নেতৃত্ব দেন। এ কারণে তাকে বহুবিধ কাজ সম্পাদন করতে হয়। সঙ্গত কারণেই তিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রীর পদমর্যাদা

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী অত্যধিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতার মধ্যমণি তিনি। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উলে- খ আছে যে, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কিংবা তার কর্তৃত্বে বাংলাদেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। রাষ্ট্রপতি 'প্রধানমন্ত্রী' ও 'প্রধান বিচারপতি' নিয়োগ ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতি

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। তার ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী নিয়োগ লাভ করবে।" প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমান সংবিধানের বিধান হলো, যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, সংসদীয় রীতি অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করবেন। তবে যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন ব্যক্তি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তার সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

নিচে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

১। **শাসনসংক্রান্তঃ** দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও দপ্তর বণ্টন, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

মন্ত্রীদের কাজের সমন্বয় ও পর্যালোচনা, মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব ও মুখ্য ভূমিকা পালন এবং দেশের প্রশাসনিক অবস্থার পর্যালোচনার কাজ প্রধানমন্ত্রী করে থাকেন। রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

২। আইনসংক্রান্ত: প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে আইন প্রণীত হয়। তিনি সর্বদা সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিলের খসড়ার ওপর বক্তব্য রেখে তিনি সংসদকে বিলের পক্ষে প্রভাবিত করতে পারেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে ও স্থগিত রাখতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন এবং লিখিতভাবে পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেবেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৩। অর্থনীতি সংক্রান্ত: জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের অভিভাবক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন ও সংসদে পেশ করেন। তাছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সংসদ অর্থ মঞ্জুরি দিতে অসমর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ষাট দিনের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দিতে পারেন।

৪। রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা: প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রীসভার সংযোগ রক্ষা করবেন। মন্ত্রীসভার বক্তব্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা এবং প্রয়োজনবোধে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত। এছাড়া রাষ্ট্রপতির বক্তব্য তিনি মন্ত্রীসভায় উপস্থাপন করবেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ঘোষণা করা, ভেঙে দেওয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করবেন। সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন।

৫। জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সংকটকালে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে আসে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের সংহতির জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছু করে থাকেন।

৬। জরুরি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী: দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। সে অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন। যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন।

৭। মন্ত্রীসভার নেতা: প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট গঠিত হয়। তাকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট পরিচালনা করেন এবং তার পতন ঘটলে কেবিনেটেরও পতন ঘটে। এজন্য বলা হয়, He is central to its formation, central to its life and central to its death.

৮। পররাষ্ট্র নীতির প্রধান নির্ধারক: প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তার সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মূল কারণ

১. উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় ভাবমূর্তি;
২. সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা;
৩. প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগে মন্ত্রীসভাসহ সংসদের বিলুপ্তি;
৪. সাংবিধানিক অসীম ক্ষমতা;
৫. পারিবারিক ঐতিহ্য;
৬. নিজের দলে একক ক্ষমতার অধিকারী; এবং
৭. নিজ দলে চ্যালেঞ্জহীন নেতৃত্ব;

সারসংক্ষেপ

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরেই পরিচালিত হয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড। এজন্য তাকে ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ (Keystone of the cabinet orch)। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা আর জবাবদিহিতার মধ্যেই সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা-ভাবমূর্তি নির্ভর করে। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন: ৯.৫

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার কারণ কী? বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী লিখুন।
২. 'সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু' –বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচনা করুন।

পাঠ-৬: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও মর্যাদা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু তিনি সরকার প্রধান নন। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই তাঁর নামে সকল কার্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু তিনি কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তার পদটি অনেকটা অলংকারিক। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই তাঁকে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাস্তবিক অর্থে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতাগুলো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করেন। কেবল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বাধীন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিতকরণ ও ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে এবং দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দান, উৎসাহ প্রদান ও সতর্ক করার অধিকার রাখেন। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা

সংবিধানের ৪৮ ও ৫৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণীত হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো কাজ করতেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন অনেকটা ভারতের রাষ্ট্রপতি বা ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর মতো। চতুর্থ সংশোধনী আইন ও অন্যান্য সংশোধনীর আদেশের ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে তুলনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন শাসনব্যবস্থার মধ্যমনি। কিন্তু দ্বাদশ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের মতো হয়েছেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। প্রচুর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেও তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। শুধু আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রধান বিচারপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো কাজ করতে বাধ্য। সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তার বিরুদ্ধে কোনো রকম ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে না। এমনকি তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য আদালত থেকে কোনো রকম পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিতা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মতো তিনিও যেকোনো অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তিকে এমনকি ফাঁসির আসামীকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারেন।

ক. রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা: কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে চাইলে তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকবে হবে-

ক. তাঁকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
খ. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্যূন পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর বয়স্ক হতে হবে;
গ. তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন;
ঘ. তিনি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি কখনো এই সংবিধান অনুযায়ী অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত হননি; এবং
ঙ. শাস্তিপ্রাপ্ত হলে মুক্তির অন্যূন দু বছর অতিবাহিত হতে হবে।

খ. নির্বাচন পদ্ধতি: রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। একাদিক্রমে কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদে ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন না। জাতীয় সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন থেকে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকার্য পরিচালনা করবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী: বাংলাদেশ সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা পালন করবেন। সরকারের নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত হবে রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ দান করবেন।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে তিনি জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধান সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের কমিশন মঞ্জুরি ও বাহিনী প্রধানদের নিয়োগ করবেন। তিনি বাংলাদেশের এ্যাটর্নী জেনারেল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রধান নির্বাচনী কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার এবং সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগ ও তাঁদের কার্যের শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন।

তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিচারপতির নিয়োগ দান করবেন। এখানে বলা দরকার, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একক ক্ষমতার অধিকারী। প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্তঃ রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারেন। তবে সংসদ ভেঙে দিতে হলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি দরকার। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রতি বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় জাতীয় সংসদে ভাষণ দান করে থাকেন। কোনো বিল জাতীয় সংসদে গৃহীত বা পাস হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি দান করবেন অথবা নিজস্ব সংশোধনী প্রস্তাবসহ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে সংসদে পুনঃ বিবেচনার জন্য ফেরত দিতে পারবেন। এরূপ বিল পুনর্বিবেচনার পর জাতীয় সংসদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত বা পাস হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিতে হবে। ৭ দিন পর ধরে নেওয়া হবে যে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন এবং তা আইনে পরিণত হয়েছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার অংশবিশেষে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবার বা সংকটের সম্মুখিন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। অবশ্য এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে ভোগ করেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন। জরুরি অবস্থার মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়ন

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে না থাকলে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবেচনামত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'অধ্যাদেশ' প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। এসব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হবে। তবে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হতে হবে। সংসদে পাস না হলে ৩০ দিন পর তা বাতিল হয়ে যাবে।

অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থবিল বা সরকারী অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো মঞ্জুরি দাবি পেশ করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি বা অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোনো দন্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করতে এবং যেকোনো দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করতে পারবেন।

পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলীঃ বাংলাদেশের হাই কমিশনার, রাষ্ট্রদূত ও কনসালদের নিয়োগ দান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র প্রধান, কিন্তু তিনি সরকার প্রধান নন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সকল বিষয়ে প্রধামন্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে এবং তার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পরামর্শ বা অভিমত প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তবে এটি ঠিক, আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা না থাকলেও তিনি ভিন্ন মত পোষণ করে যদি বিল সংসদে পুনঃবিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান, তবে সরকার বিব্রত হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে বিরোধী দল বিষয়টিকে ইস্যু করতে পারে।

পাঠোত্তোর মূল্যায়নঃ ৯.৬

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী লিখুন।

২. 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত'–আপনি কীভাবে এ মন্তব্য মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ-৭: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দল বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশে দীর্ঘ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এটি ঠিক, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের অতিবিকাশ হয়েছে। একটি গবেষণা মতে, দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুই শতাধিক। সঙ্গত কারণেই বিভক্তি, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উপদলীয় কোন্দল, দল ভাঙন, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অভাব বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে একমত পোষণ করে সেই সকল সমস্যা সমাধানে ইশতেহার প্রচার করে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে।

রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা Stasiology (স্টাসিউলজি) নামে পরিচিত। Stasiology শব্দটি গ্রিক শব্দ Stasis থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রচার করা। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে রাজনেতিক দল হলো এমন কতিপয় জনসমষ্টি যারা নিজেদের নীতি জনম্মুখে প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টার প্রধান লক্ষ হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল বল প্রয়োগের মাধ্যমেও ক্ষমতা গ্রহণ করে।

R. I. Maclver-এর মতে, রাজনৈতিক দল বলতে সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার গঠন করে।

সুম্পিটার (Schumpeter) বলেন, রাজনৈতিক দল হলো এমন একটি সংস্থা, যার সদস্যরা সুনির্দিষ্ট নীতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

অতএব যখন সম-মতাদর্শে বিশ্বাসী নাগরিকদের একটি সুসংগঠিত অংশ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে তৎপর হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১. রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা;
২. জনমত গঠন;
৩. সুনির্দিষ্ট নীতি;
৪. সম-মতাদর্শ;
৫. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ;
৬. স্বার্থ উত্থাপন ও একত্রীকরণ;
৭. রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নিয়োগ;
৮. সংগনিক কাঠামো ও নেতৃত্ব;

রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলব্যবস্থা মূলত নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ওপর। সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়–

ক. এক দলীয় ব্যবস্থা: এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে কেবল একটি রাজনৈতিক দল থাকে। সমাজতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণত এ দলব্যবস্থা দেখা যয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনামে এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা: রাষ্ট ক্ষমতা দখলের জন্য কার্যত মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র এর সবচে বড় দৃষ্টান্ত।

গ. বহুদলীয় ব্যবস্থা: বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, বৃটেনে এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা

১। **আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার** অভাব: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের তেমন চর্চা হয় না। প্রধান রাজনেতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে তো বটেই; এমনকি ক্ষুদ্র রাজনেতিক দলেও সিদ্ধান্ত ওপর বা কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

২। **বহুদলীয়:** বাংলাদেশ রাজনৈতিক দল গঠনে তেমন কোনো বাধানিষেধ নেই। এ কারণে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। দেশে দুই শতাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে।

৩। **সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও আন্দোলন দেশ ও জনগণের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জাতীয় রাজনীতিতে হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

৪। **সহিষ্ণুতার অভাব:** বাংলাদেশ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে সহিষ্ণুর অভাব লক্ষণীয়। সহিষ্ণুতার অভাবে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের প্রতি অগণতান্ত্রিকভাবে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে থাকে। যা গণতন্ত্রের যাত্রাপথকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

৫। **ঐকমত্যের অভাব:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো সহিষ্ণুতা ও পরিপক্বতা অর্জন করতে পারেনি বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে ঐকমত্য অর্জন করতে পারেনি রাজনৈতিক দলগুলো।

৬। **ক্ষমতাসীন দলের অনমনীয়তা:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাতীয় ও জনগুর"ত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের দাবির প্রতি অনমনীয়তা প্রদর্শন করে।

৭। **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব:** গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল্যবোধের প্রতি নেতৃবৃন্দের অনীহা ও শ্রদ্ধার অভাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮। **প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থা:** প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থায় দুটি প্রবণতা লক্ষণীয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থা। বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক দলব্যবস্থা বিদ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশ ২ শতাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থার নামে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের জন্ম দেশে এক অসুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া গোটা কয়েক দল ব্যতীত অধিকাংশ দলই নামসর্বস্ব।

৯। **শহরভিত্তিক দল:** বাংলাদেশের মাত্র গুটিকয়েক রাজনৈতিক দলব্যতীত অধিকাংশ দলেরই অবস্থান রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক। ফলে রাজধানী ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রাজনীতির মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১০। **অভ্যন্তরীণ কোন্দল:** বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনেতিক দলের কর্মসূচি উদ্দেশ্যবিহীন বলেই তারা কোনো গঠনমূলক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। এতে করে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা হতাশায় ভোগে। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনেকটা বল্গাহীন হয়ে থাকে। এতে করে ব্যক্তিগত কোন্দল ও কলহের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এখানে রাজনীতি অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় জাতীয় ঐক্যের কোনো সিদ্ধান্ড় গ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত হয় না। তাই দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

১১। **যোগ্য নেতৃত্বের অভাব:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। ফলে দলগুলো তাদের দলীয় আদর্শ সঠিকভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে না। যে কারণে জনগণ রাজনীতিকে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। আর দলসমূহের মধ্যে আদশৃগত বিরোধ সব সময় লেগেই থাকে।

১২। **সংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের রাজনেতিক দলসমূহের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহ হলো অসংগঠিত ও দলাদলিবিশিষ্ট রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। বাংলাদেশের রাজনেতিক দলগুলো মূলত এক বা একাধিক নেতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই নেতারা অত্যধিক আনুগত্য ও জনপ্রিয়তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দলীয় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

১৩। **ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনীতি চর্চা মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক। সরকারি দল চায় যেকোনোভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে রাখতে, আর বিরোধী দল চায় যে কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে।

১৪। **কর্তৃত্ববাদী চরিত্র:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কর্তৃত্ববাদী চরিত্র বিদ্যমান। এখানে যে সমস্ত দল গণতন্ত্রের কথাবলে সে সমস্ত দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। বরং রয়েছে iron law of oligarchy. এই কর্তৃত্ববাদী চরিত্র গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

১৫। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা: বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলসমূহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে।

১৬। নিম্ন রাজনেতিক সংস্কৃতি চর্চা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীদের কার্যকলাপে, সংলাপে নিম্নরাজনৈতিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ প্রতিফলিত হয় যা রাজনেতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম অন্তরায়।

১৭। দলীয় বিভক্তি ও ভাঙন: বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক দলসমূহ একাধিকবার ভাঙনের সম্মুখিন হয়।

ক. নেতাভিত্তিক বলে নেতা মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট না থাকায় দল বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন-আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়।

খ. নেতৃত্বের মোহও রাজনৈতিক দল ভাঙনের অন্যতম কারণ।

গ. বাংলাদেশে অনেক সময় আদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণেও দল ভাঙনের সম্মুখিন হয়েছিল।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার মোহ ও বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এখানে সুসংগঠিত প্রতিযোগিতামূলক রাজনেতিক দলব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক, বেসামরিক আমলা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং সুবিধাভোগী দলছুট নেতাদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বস্তুত দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে যথাযথ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অভাবে বাংলাদেশে এখনো রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৭

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিন। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

২. রাজনৈতিক দলব্যবস্থা কি? বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ-৮: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নাম জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, বিকাশ, কর্মসূচির লক্ষ্য ও সফলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

গণতন্ত্র রক্ষা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

প্রান্তঃস্থ পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের বিকাশ পশ্চিমা বিশ্বের মতো ঘটেনি। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় রাজনৈতিক দল। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটেছে উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন ও আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে সমান ভূমিকা রাখেনি। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নাম দেয়া হলো–

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল (বিএনপি)
৩. জাতীয় পার্টি
৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
৫. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৬. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)
৭. গণতন্ত্রী পার্টি
৮. জাতীয় লীগ
৯. বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
১০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
১১. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
১২. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
১৩. সাম্যবাদী দল
১৪. বাংলাদেশ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
১৫. গণফোরাম
১৬. জাকের পার্টি
১৭. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
১৮. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
১৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিধায় এখানে বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দরিদ্র দেশে এতগুলো রাজনৈতিক দল কখনো সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে না। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও পুরাতন দল। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী বিরোধীদল হিসেবে এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন এর নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্ড়ান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শামসুল হক। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দলটিকে অসাম্প্রদায়িক করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেবার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তখন থেকে দলটি শুধু 'আওয়ামী লীগ' নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৫৪ সারে যুক্তফ্রন্টের প্রধান দল ছিল আওয়ামী লীগ। দলটির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১৯৫৬-৫৭ সালে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দলটির প্রধান নেতায় পরিণত হন। তাঁর নেতত্বে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বৈষম্যের

বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এ দল স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো হতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙ্গালির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে দলটি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস ব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে দলটি ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে দলটি পুনরায় সুসংগঠিত হয়। পর হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম দল হিসেবে সংসদে আসন লাভ করেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর এ দল সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ২৫৮ টি আসনে বিজয়ী হয়ে দলটি আবার ক্ষমতায় আসে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল দল। জনকল্যাণ সাধন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই আওয়ামী লীগের মৌল আদর্শ। দলটি কৃষক ও শ্রমিক বান্ধব বলে বহির্বিশ্বে স্বীকৃত।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম দল। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে 'জাগদল' নামে একটি দল গঠিত হয়। তবে তার সাথে জেনারেল জিয়াউর রহমান সরাসরি জড়িত ছিলেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য একটি রাজনেতিক দলের প্রয়োজন পড়ে। এ লক্ষ্যেই জিয়াউর রহমান ঢাকার রমনা গ্রীনে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৭৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এ দল ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৬টি আসনলাভ করে। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থী আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল সর্বমোট ১৪১টি আসন লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। কিন্তু বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় সংসদে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০০১ সারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্য জোট ও জাতীয় পার্টির একাংশ মিলে চারদলীয় জোট গঠন করে এবং দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করে।

জাতীয় পার্টি: ১৯৮২ সালে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল এরশাদ তাঁর সরকারকে বেসামরিকীকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর 'জনদল' নামে একটি দল গঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জেনারেল এরশাদের প্রেরণায় ঢাকার জাতীয় ফ্রন্ট অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে ডা: এম এ মতিন জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনিই এ দলের প্রথম মহাসচিব। ১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর জেনারেল এরশাদ এ দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন লাভ করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তীব্র গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ পদত্যাগ করেন এবং জাতীয় পার্টি সরকারের পতন ঘটে। ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি যথাক্রমে ৩৫টি, ৩৩টি ও ১৩টি আসনলাভ করে। জাতীয় পার্টির কর্মসূচি হলো উন্নয়ন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রভৃতি। বর্তমানে দলটি একাধিক বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

জামায়াতে ইসলামী: জামায়াতে ইসলামী একটি পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪১ সালে মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এই দলটি গঠন করেন। ১৯৫১ সালে মওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দলটি তার শাখা সম্প্রসারিত করে। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী দলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দলটি স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনীকে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করে। যার ফলে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এ দলটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর দলটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক গোলাম আযম এ দলের আমির বা প্রধান নিযুক্ত হন। বর্তমানে এ দলের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে এ দলটি ১০টি আসন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসন এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ৩টি আসন এবং ২০০১ সালে ১৭টি আসন লাভ করে। এ দলের মূল লক্ষ্য ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা। দলটির অসংখ্য নেতা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। বর্তমানের দলটির প্রথম সারের অনেক নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) : স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রলীগের এক অংশ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতি ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সহসভাপতি আ স ম আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ এর নেতৃত্বাধীন এ গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের মে মাসে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদীয় শাসনপদ্ধতি পরিহার করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠনের দাবি করে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ দাবি অগ্রাহ্য করলে আ স ম আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর। সিরাজুল ইসলাম খান হন এ দলের প্রধান সংগঠক। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এ দল ১টি আসন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ৭টি আসন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১টি আসন, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ১টি আসন লাভ করে। ২০০১ সালের নির্বাচনে কোনো আসন পায়নি। বর্তমানে দলটি সমর্থনহীনতায় মৃত প্রায়। তাছাড়া নেতৃত্বে কোন্দলে দলটি কয়েকবার ভাঙ্গনের মুখে পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.৮

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কি? দলগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর।